# মহীতোষ বিশ্বাস

# রচনা সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সংকলন ও সম্পাদনা

অভিষেক বিশ্বাস  ঋত্বিকা বিশ্বাস

পুনশ্চ

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| বিন খংগ্ড়ৈ সংগ্রাম | ৯ |
| পরতাল | ৫৪১ |

## ।। ১ ।।

সে হয়তো কয়েক কোটি বছর আগেকার কথা। পৃথিবী জুড়ে তখন চলছে নানা ভাঙা-গড়ার খেলা। প্রকৃতি তখন নানা রূপে সাজিয়ে চলেছে পৃথিবীকে। এ অঞ্চলটিতেও তখন প্রকৃতি তার খেয়ালের খেলা খেলে চলেছে অবিরাম। ফাটল ধরল ভূ-ত্বকে। পৃথিবীর জঠর থেকে বেরিয়ে এল তরল লাভা। গোটা অঞ্চলটাকে ঢেকে দিল চাদরের মতো। কদিন থেমে থাকে। তারপর শুরু হয় আবার সেই লাভা-বর্ষণ। স্তরে স্তরে, দীর্ঘ গভীরতায় সেই লাভা জমে ওঠে পৃথিবীর গায়ে। সেই আদিম পৃথিবীতে পার হয়ে যায় দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। অঞ্চল-জোড়া সেই নিরেট সুগভীর লাভাত্বকের উপর কখনও নেমে আসে প্রবল বারিধারা। কখনও ঝোড়ো বাতাস। ঝড় জল রোদে ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকে সেই লাভা-স্তর। এইভাবে ক্ষয়ে পুরো অঞ্চলটা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিচে নেমে গেছে ধাপে ধাপে। ধাপগুলোর মাথা টেবিলের মতো চ্যাপটা বা সমতল আর পাশের অংশ বেশ খাড়া। দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলটা সিঁড়ি বা ট্র্যাপের মতো দেখতে। মহারাষ্ট্র রাজ্যের এই উত্তর দাক্ষিণাত্য মালভূমি বা লাভা মালভূমিকে ভূতত্ত্ববিদেরা তাই নামকরণ করেছেন ডেকানট্র্যাপ বলে। কালো ব্যাসল্ট শিলা দিয়ে গঠিত এখানকার লাভাজাত মৃত্তিকা। মাটির রং তাই কালো। অঞ্চলটি কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চল নামে খ্যাত।

মাঝে-মধ্যে শহর অঞ্চল। প্রাচীনতা আর অ-আধুনিকতা দিয়ে ঘেরা। শহরের সীমানাটুকু পার হলেই আদিগন্ত খেত-প্রান্তর। মাটির রং কালচে। মাটিতে চুন ও কাদার ভাগ বেশি। মাটিতে জল-ধারণের ক্ষমতাও তাই বেশি। কিন্তু গ্রীষ্মকালে মাটিতে দেখা দেয় গভীর ফাটল। ফলে চাষ-বাসে অসুবিধা দেখা দেয়। কার্পাস তুলাই এ-মাটির সব থেকে বড়ো কৃষিজ ফসল। আখের খেতও চোখে পড়ে মাঝে মাঝে। এছাড়া হয়েছে মিলেটের চাষ। জোয়ার, বজরা, রাগী প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণির ছোটো আকারের দানা শস্যকে বলে মিলেট। এই চাষ বেশ জনপ্রিয় এখানে। কারণ এর চাষে উর্বর মাটি বা জলের বিশেষ দরকার হয় না। যে কোনও ভূ-প্রকৃতিতেই এদের চাষ সম্ভব। মাঝে মাঝেই কাশ ও সাবাই ঘাসের অবাধ তৃণভূমি। কোথাও কোথাও নানা আগাছা আর কাঁটা ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল। তারই মধ্যে কোথাও বা মাথা উঁচু করে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে শাল, শিমুল, শিরিষ, অশ্বত্থ, বনশাল, বাবলা। বা অন্য কোনও দীর্ঘাকৃতি বনস্পতি।

এরই মধ্যে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে এক একটি গ্রাম। ভারতবর্ষের আর পাঁচটা গাঁয়ের মতো দেখতে। গ্রামের একদিকে ব্রাহ্মণ বা সমাজের উঁচু বর্ণের মানুষদের বাস। টালির ছাউনির ঘর। সঙ্গতি অনুযায়ী পাকা ঘরও আছে। গ্রামের প্রত্যন্ত সীমায় আর একটি পল্লী। এ-পাড়ায় থাকে মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। মাহাররা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য। এক ফালি জমিতে ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি ক'রে তাদের ঘরগুলো। ঘরের ছাউনিতে টালি ব্যবহার করার অধিকার নেই। কাশ বা সাবাই ঘাসের ছাউনি। বড়ো জোর খাপরার ছাউনি দিতে পারে। এই অন্ত্যজ পল্লীতে তারা বংশানুক্রমে জন্মায় অন্ত্যজ হয়ে। বেঁচে থাকে অন্ত্যজ হয়ে। মরেও অন্ত্যজ হয়ে।

মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্যদের মধ্যে মাহারদের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও রয়েছে আরও নানারকম অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। মারিয়া, খোটে, চামার, পঞ্চম, অতিশূদ্র—হরেক রকম বিভাজন। কিন্তু সবারই একটাই

পরিচয়। তারা অন্ত্যজ, তারা অস্পৃশ্য। অন্যদিকে ছত্রপতি শিবাজির দেশ মহারাষ্ট্র। পেশোয়াদের গৌরব-গাথার দেশ মহারাষ্ট্র।

এই মহারাষ্ট্রেরই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের একজন মানুষ রামজী শকপাল। মিলিটারিতে চাকরি করেন রামজী। চাকরিসূত্রে বাস করেন মহারাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাজ্য মধ্যপ্রদেশের মউ শহরে। মহারাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে মধ্যপ্রদেশের কিছু ভিতরে গেলেই ছোট্ট শহর মউ। ভৌগোলিক আর প্রাকৃতিক দিক দিয়ে তেমন কোনও ফারাক নেই সীমান্তবর্তী দুই রাজ্যের আঞ্চলিকতায়। মউ শহরে পাঁচমিশেলি লোকের বাস। ছোট্ট শহরের সীমানাটুকু পার হলেই আবার খেত খামার। কোথাও তৃণভূমি। মাঝে মাঝে গ্রাম । গ্রামের একদিকে যথারীতি ভদ্র সমাজের বর্ণ হিন্দুদের বাস। গ্রামের উপান্তে কোনও না কোনও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের দীন অবস্থান।

রামজী শকপালের জন্ম অস্পৃশ্য মাহার বংশে। কিন্তু অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ হয়েও আপন যোগ্যতায় সেকালের নর্মাল স্কুল থেকে ট্রেনিং নিয়ে রামজী মিলিটারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। মারাঠি ও ইংরেজি ভাষায় ছিল বিশেষ দক্ষতা। খেলাধূলাতেও পারদর্শী। যেমন পেটানো স্বাস্থ্য, মনটাও তেমনই উদার। রামজী শকপালের বাবা ছিলেন মালোজী শকপাল। এঁদের পৈতৃক বাসস্থান ছিল সেকালের বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার ছোটো শহর মণ্ডনগড় থেকে মাইল পাঁচেক দূরে আম্বাবাদে গ্রামে । মালোজীও চাকরি করতেন মিলিটারিতে। মাহাররা অস্পৃশ্য হলেও বরাবরই বীরের জাত। মারাঠা রাজাদের সেনাবিভাগে মাহারদের জন্য আলাদা রেজিমেন্ট ছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সূচনা-পর্বে মাহার সম্প্রদায়ের যথেষ্ট নিয়োগ ঘটেছিল সেনাবাহিনীতে। অবশ্য নানা কারণেই আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে একটা কথা মানতেই হবে। ইংরেজরা তাদের সেনাবাহিনীর প্রতিটি ক্যাম্পেই শিক্ষাদানের জন্য স্কুলের অনুমোদন করেছিল। সেনাবাহিনীতে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের তো বটেই, তাঁদের পরিবারের লোকজনেরও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। হয়তো এতে ইংরেজদের স্বার্থ ছিল। কিন্তু এতে যে এদেশের সমাজের একেবারে নীচের তলার মানুষেরা অনেকটাই উপকৃত হয়েছিলেন, একথা যথার্থ।

মালোজী শকপালের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন দুজন—রামজী আর মীরাবাঈ। মীরা বিধবা হবার পর দেশের বাড়িতেই থাকতেন। নিঃসন্তান। রামজীর তেরোটি সন্তানের মধ্যে বেঁচে আছে এখন মাত্র চারজন। আর সব কজনেরই ঘটেছে অকালমৃত্যু। বড়ো দুই ছেলে—বলরাম রাও আর আনন্দ রাও। দুই মেয়ে—মঞ্জুলা আর তুলসী। রামজীর স্ত্রীর নাম ভীমাবাঈ। মিলিটারিতে চাকরির সূত্রে সপরিবারে রামজী এখন বাস করেন মউ-এর মিলিটারি কোয়ার্টার্সে।

এরই মধ্যে একদিন দেশের বাড়ি থেকে মীরা বেড়াতে এলেন দাদা রামজীর কাছে। বিধবা হবার পর থেকে মীরার মনটা ভালো নেই। দাদা-বৌদির আশ্রয়ে, ভাইপো- ভাইঝিদের নিয়ে, কটা দিন যদি একটু শান্তি পাওয়া যায়।

মীরা দেখতে মোটেই সুন্দরী নন। বেঁটে, তার উপরে পিঠের উপর একটা কুঁজ। কিন্তু মানুষটার মনটা বড়োই মায়া-মমতায় ভরা। সরল, সাদাসিধে। খুবই কর্মঠ। সংসারের নানা কাজে তাঁর আগ্রহও খুব।

অনেকদিন বাদে বোনকে কাছে পেয়ে রামজীরও বড়ো ভালো লাগল। ছোটোবেলায় এই বোনটাই ছিল তাঁর খেলার সঙ্গী। মীরার অকাল-বৈধব্য রামজীর মনটাকে বিষণ্ণ করে রেখেছিল। হতভাগিনী বোনটার কথা মনে পড়ত প্রায়ই। অনেকদিন বাদে সেই মীরাকে দেখতে পেয়ে তাঁর মনটা ভরে উঠল আনন্দে। বউদি ভীমাবাঈও ননদকে কাছে টেনে নিলেন সানন্দে। মিলিটারি কোয়ার্টার্সের একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য এল। কিন্তু মিলিটারি কোয়ার্টার্সের এই আপনি-কুপনির জগতে ক'দিনেই যেন মনটা হাঁফিয়ে ওঠে মীরার। দেশের বাড়িতে খোলামেলা জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত। এত বাঁধা-ধরা জীবন নয় সেখানে।

দাদার বাসা থেকে বেরিয়ে বড়ো মতো একটা মাঠ পেরিয়ে একটা নদী আছে। নদী নয়, শাখানদী। বর্ষাকালে জলে ভরে ওঠে। স্রোতের টান হয়ে ওঠে জোরালো। গ্রীষ্মকালে স্রোত থাকে না। শুধু এখানে ওখানে জল জমে থাকে খাবলা খাবলা। কিন্তু সে নদীটার কথা এতদিনে জানা হয়ে গেছে মীরার।

হঠাৎ ভীমাবাঈয়ের কাছে এসে বলেন—'ময়লা জামাকাপড়গুলো দাও তো বউদি। আর একটা সাবান দাও। নদী থেকে কেচে আনি ওগুলো।'

ভীমাবাঈ হেসে বলেন—'কেন ঠাকুরঝি, বাড়িতে কী জলের অভাব পড়েছে, না কাপড়-কাচা লোকের অভাব হয়েছে, যে তোমাকে গিয়ে নদী থেকে কাপড় কেচে আনতে হবে।'

—'যাই না বউদি, নদী থেকে একটা ডুবও দিয়ে আসি। অমনি কাপড়-চোপড়গুলোও কেচে নিয়ে আসি।'

অগত্যা রাজি হতে হয় বউদিকে। ময়লা কাপড়গুলো পুঁটলি পাকিয়ে মীরা চলে যান নদীতে।

আর এইভাবে রোজই ছুতো-নাতা করে একবার নদীতে যাওয়া চাই মীরার।

নদীতে যেতে সময় লাগে না বেশি। বড়ো মাঠটা পার হলেই তো নদী। মাঠের এদিকটায় একটানা ফাঁকা জমি। খেতি। কিন্তু নদীর কূলে, ঠিক উপরটায়, অনেকখানি জঙ্গুলে জমি। শিমুল, শিরিষ, অশ্বত্থ, বনশাল গাছের জঙ্গল। এখন চৈত্রমাস। গরমকাল। কিন্তু জায়গাটায় সব সময় কেমন যেন ছায়া-ছায়া ভাব। দুটো শিমুল গাছের মাথা ঢেকে আছে ফুলে ফুলে। খুব ভালো লাগে জায়গাটা। আবার ঐ আধো অন্ধকার, নির্জন জায়গাটা পার হতে কেমন যেন গা ছমছম করে মীরার। জঙ্গলের গা ঘেঁষে ঐ রাস্তাটা ছাড়া নদীতে যাবার আর কোনো রাস্তাও নেই।

হঠাৎই একদিন নদীতে যাবার পথে দৃশ্যটা চোখে পড়ল মীরার। ঐ জঙ্গলের মধ্যে, একটা অশ্বত্থ গাছের তলায়, গোল হয়ে বসে আছেন চারজন সন্ন্যাসী। চুল দাড়িতে মাথা মুখ ঢাকা। খালি গা, কৌপীন পরনে। মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকি চোখে পড়ছে। বোধহয় গাঁজার কলকে ঘুরছে হাতে হাতে।

দ্রুত জায়গাটা পার হয়ে যান মীরা। কিন্তু পরপর কদিন যাতায়াতের পথে চার সন্ন্যাসীকে দেখতে দেখতে চোখ-সওয়া হয়ে যায়। নিজেই এখন যেতে যেতে, আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সন্ন্যাসীদের।

একদিন হঠাৎই চার সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হয়ে যান মীরা।

দুপুরবেলা। নদী থেকে স্নান সেরে ঘরে ফিরছিলেন। নদীর কূলে এখানে ওখানে চরে বেড়াচ্ছে দু-একটা ছাগল-ভেড়া। কিম্বা গোরু। কোথাও বা এক আধজন মানুষ। মোটামুটি নির্জন পরিবেশ। নদী থেকে উঠে আসা এবড়ো-খেবড়ো সুঁড়ি পথটা ধরে, আপনমনে উপরে উঠে আসছিলেন মীরা।

হঠাৎ দেখেন, চার সন্ন্যাসী হন হন করে এগিয়ে আসছেন এদিকে। একেবারে মুখোমুখি। সুঁড়ি পথটার দু'পাশেই ঘন কাঁটা গাছের জঙ্গল। কোনোমতে ঠেলেঠুলে, ঝোপ-জঙ্গলটা একটু ফাঁক করে, রাস্তা থেকে পাশে সরে দাঁড়ালেন মীরা। ছোঁয়াছুঁয়ি তো দূরের কথা, তার ছায়া মাড়ানোও চলবে না। সে মাহার জাতের মেয়ে। সন্ন্যাসীরা যদি উঁচু জাতের হন তো মহা অনর্থ বাধাবেন। মাহাররা অস্পৃশ্য। অচ্ছুত। অচ্ছুতদের ছায়া মাড়ানোও পাপ।

পাশে সরে দাঁড়িয়েও তীক্ষ্ণ চোখে মীরা দেখতে লাগলেন সন্ন্যাসীদের। পরনে কৌপীন, চুলদাড়ির জঙ্গল মাথায়। হাতে কমণ্ডলু। দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে গেলেন সন্ন্যাসীরা। হয়তো নদীতে যাচ্ছেন স্নান করতে।

কিন্তু পিছনের সন্ন্যাসীটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন মীরা। কে এই সন্ন্যাসী? সেই চেনামুখের আদল, হাঁটাচলার ভঙ্গি। কতদিন পার হয়ে গেছে। সময় মানুষকে কতই না বদলে দেয়। তার পরে এই মুখ-ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। চেনার কী উপায় আছে? কিন্তু সব মিলিয়ে, আদলটুকু যাবে কোথায়? আর সেই আদলটুকু দেখেই মীরার মনে হল, এ-মানুষটা তার বড়োই চেনা।